বেঙ্গল টাইমস

১৬ মার্চ সংখ্যা

নতুন ময়দানে

- ভোটের ময়দানে অর্বাচীনরা কেন?
- এত অসহিষ্ণুতা কেন?
- ডার্বি নিয়ে দুই প্রধান নিশ্চুপ কেন?
- বসন্তে পাহাড় সফর

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

সাংসদের কাজ কী, এই অর্বাচীনরা আদৌ বোঝেন!

রক্তিম মিত্র

কোন এমপি কতটা সফল? কে এলাকায় কেমন কাজ করেছেন? ভোটের বাজনা বাজলেই টিভিতে, কাগজে এই নিয়ে নানা আলোচনা, নানা পরিসংখ্যান। এমপি-রাও নিজের নিজের কাজের ফিরিস্তি দিয়ে চলেন। এসব দেখে একটা কথাই বোঝা যায়, এমপি-র কাজ কী, তা অধিকাংশ এমপি-ই বোঝেন না। আর যাঁরা এইসব সমীক্ষা করছেন, তাঁরাও বোঝেন না। এমপিকে পঞ্চায়েত প্রধানের স্তরে নামিয়ে আনা হচ্ছে। এবং, তৃণমূলের অধিকাংশ এমপি যেহেতু এমপি-র কাজটাই বোঝেন না, তাই নিজেরাও নিজেদের পঞ্চায়েত প্রধানের পর্যায়ে নামিয়ে আনছেন।

সংসদে কদিন হাজিরা, কটি প্রশ্ন তুলেছেন, কটি বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। এরকম একটা পরিসংখ্যান অনেকে কাগজে বা চ্যানেলেই উঠে আসছে। এগুলো একজন এমপি-র কাজের সামান্য অংশ। এই রাজ্যের অধিকাংশ এমপি সেজেগুজে লোকসভায় বসে থেকেছেন। কী

আলোচনা হচ্ছে, সেসব বোঝেনওনি। কারণ, বোঝার জন্য যে পড়াশোনা বা চর্চা লাগে, তার পাঁচ শতাংশও নেই। তাঁদের একটাই কাজ, নেত্রীর নির্দেশ এলেই হল্লা করে যাওয়া। আর ওয়াকআউট করে গান্ধী মূর্তির সামনে চলে আসা। তারপর কারও মাথায় কলসী, কোনও দিন গায়ে কালো সাল, কোনওদিন হাতে পোস্টার। আসলে, পার্লামেন্টটাকে দিনের পর দিন মূর্খের আখড়া বানানোয় আমাদের এমপিদের ভূমিকাও কম নয়।

আলোচনা শুনে মনে হচ্ছে, একজন এমপি–র কাজকর্ম বুঝি শুধু এমপি তহবিলের টাকা খরচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটা এমপি–দের অজ্ঞতা। সেইসঙ্গে কলকাতার কুয়োয় বসে যাঁরা বাংলার সমুদ্র বোঝার চেষ্টা করেন, তাঁদেরও অজ্ঞতা। আসলে, একটা লোকসভা কত বড় হয়, সে সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। কোন লোকসভার মধ্যে কোন কোন বিধানসভা পড়ে, সেসম্পর্কেও কোনও ধারণা নেই। তাই এই সীমাহীন অজ্ঞতা গেলানো হচ্ছে দর্শক ও পাঠককে।

একজন এম পি এলাকা উন্নয়নে বছরে কত টাকা পান? পাঁচ কোটি। এম পি–রা পরিসংখ্যান দিয়ে চলেছেন, চারটি পথবাতি, দুটি শ্মশান সংস্কার, ছটি অ্যাম্বুলেন্স, তিনটি চিলড্রেন্স পার্ক, তিনটি গ্রামীণ রাস্তা, তিনটি নিকাশি নালা, ছটি সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি ইত্যাদি। আরে ভাই, এটা কোনও এম পি–র কাজ? একজন পঞ্চায়েত প্রধান তো এক বছরে এর থেকে বেশি কাজের ফিরিস্তি দিতে পারেন।

একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট কত, ধারনা আছে? কতগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে একটি লোকসভা হয়, ধারনা আছে? একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে বছরে গড়পড়তা প্রায় পাঁচ কোটি টাকার কাজ হয়। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজের রূপায়ণ ধরলে অঙ্কটা সাত থেকে আট কোটি। অর্থাৎ, একজন প্রধান চাইলে বছরে আট কোটি টাকার কাজের ফিরিস্তি দিতে পারেন।

পনেরো থেকে কুড়িটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে একটি বিধানসভা। এমন সাতটি বিধানসভা নিয়ে একটি লোকসভা। অর্থাৎ, একটি লোকসভার মধ্যে প্রায় ১২০ খানা গ্রাম পঞ্চায়েত (শহুরে বুদ্ধিজীবীরা আবার একটি গ্রাম পঞ্চায়েত মানে একটি গ্রাম ভেবে নিতে পারেন। তাঁদের অবগতির জন্য জানাই, একটি গ্রাম পঞ্চায়েত মানে কোথাও কোথাও পনেরোটিও বেশি গ্রাম। একেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেতর কলকাতার তিনটি বিধানসভা ঢুকে যাবে।)। অর্থাৎ, একজন এমপি–র লোকসভা এলাকায় প্রায় ১২০ জন পঞ্চায়েত প্রধান থাকেন। দেখা যাচ্ছে, একজন এম পি কাজের ফিরিস্তি দিচ্ছেন, একজন প্রধানের ফিরিস্তি তার থেকে অনেক বেশি। তার মানে, একজন এম পি নিজেকে কোন স্তরে নামিয়ে আনছেন?

আসলে, এলাকা তহবিলের ফিরিস্তি কেবল অক্ষম এমপিরাই দিতে পারেন। আড়াই দশক আগেও তো এলাকা উন্নয়ন তহবিলই ছিল না। তার মানে, তখন কি এম পি–র কোনও কাজ ছিল না? তৃণমূলের অধিকাংশ এম পি

এমপি চাইলে, উদ্যমী হলে নিজের এলাকায় বছরে হাজার কোটি টাকার প্রকল্প আনতে পারেন। যাঁরা সেটা পারেন না, সেই অর্বাচীনরা পাঁচ কোটি টাকার ফিরিস্তি দেন।

একসময় এই রাজ্য থেকে কারা লোকসভায় গেছেন! ত্রিদিব চৌধুরি, হীরেন মুখার্জি, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, চিত্ত বসু, প্রণব মুখার্জি, সোমনাথ লাহিড়ী, সোমনাথ চ্যাটার্জি, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, জ্যোতির্ময় বসু। এমনকী আট-নয়ের দশকেও বাসুদেব আচারিয়া, সৈফুদ্দিন চৌধুরি, প্রমথেশ মুখার্জি, গুরুদাস দাশগুপ্ত। কী সব দুরন্ত ডিবেট! সৌগত রায়, আর কিছুটা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আর এই টার্মে মহুয়া মৈত্র ছাড়া তৃণমূলের কারও সেই রাজনৈতিক উচ্চতা আছে? সব তালে তালে দিয়ে যাওয়া হ্যাঁ হ্যাঁ বলা সঙ। সংসদের মানকে কোথায় টেনে নামাচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো! এসব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না। মিমি কী পোশাক পরলেন, নুসরত কী খেলেন, আগেরবার সেই আলোচনা লোকে রসিয়ে রসিয়ে গিলেছে। এবারের মাতামাতি রচনা ব্যানার্জি, জুন মালিয়া বা সায়নী ঘোষদের ঘিরে। ভাগ্যিস, মিমি-নুসরতরা নেই। নইলে, আরও কত ন্যাকামি যে দেখতে হত, কে জানে! বছরে পাঁচ কোটির বাইরেও যে একটা বিরাট জগৎ আছে, সেটা এই অর্বাচীনদের কে বোঝাবে!

বছরে ওই পাঁচ কোটি খরচটাকেই একজন এমপি-র কাজ বলে ভেবে নিয়েছেন। আর তাই ওই টাকা খরচ করে নিজেরাই নিজেদের পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন। ১) এলাকার কতগুলো সিঙ্গল লাইনকে ডাবল লাইন করার উদ্যোগ নিয়েছেন? ২) কটা নতুন ট্রেন চালুর উদ্যোগ নিয়েছেন? ৩) বৈদ্যুতিক লাইন করার পেছনে কতটুকু ভূমিকা আছে? ৪) রেলের কারখানা বা হাসপাতাল করার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ আছে? ৫) মেট্রো রেলের কাজ বছরের পর বছর ধরে ঢিমেতালে চলছে কেন? দশ বছরেও নতুন কোনও লাইন তৈরি হল না কেন? ৬) রাজ্যের অসমাপ্ত রেলপ্রকল্পগুলি কী অবস্থায় আছে? ৭) বিভিন্ন এলাকায় ওভারব্রিজ বা আন্ডারপাস করার ক্ষেত্রে কতটুকু উদ্যোগ নিয়েছেন? শুধু রেল নিয়েই আরও একগুচ্ছ প্রশ্ন তোলা যায়। এর বাইরে আরও অন্তত পঞ্চাশখানা দপ্তর আছে। সেইসব দপ্তরের কী কাজ, সেইসব প্রকল্প কীভাবে নিজের রাজ্যে বা এলাকায় আনা যায়, সে ব্যাপারে কোনও ভাবনাচিন্তা বা শিক্ষাদীক্ষা আছে? একজন

বামেদের এত অসহিষ্ণুতা কেন?

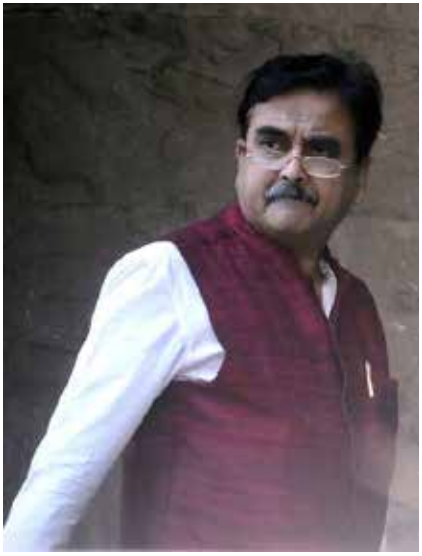

অজয় কুমার

হঠাৎই যেন চমকে দেওয়ার মতো খবর। বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি পদত্যাগ করছেন। তিনি রাজনীতির ময়দানে নামতে চান। কোন দলের হয়ে নামতে চান, তিনি নিজে ঘোষণা না করলেও বুঝতে বাকি রইল না।

দু–তিনদিন চলল নানা জল্পনা। তিনি কোথায় যোগ দেবেন। কেউ বললেন, বাম শিবিরে। কংগ্রেসও স্বাগত জানিয়ে রাখল। অনেকেই বললেন, তিনি যাবেন বিজেপিতে। যদিও শেষের পাল্লাটাই ভারী, এমনটা বোঝাই যাচ্ছিল। এমনকী, কোন কেন্দ্রে দাঁড়াবেন, তাও প্রচার হয়ে গেল।

বিষয়টা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কী চর্চা হচ্ছে, তা বুঝতে একটু চোখ রাখা। বামেদের একটা বড় অংশ ধরে নিয়েছিলেন, তিনি হয়তো বাম শিবিরেই আসছেন। আশা করতে বাধা নেই। এমনকী দায়িত্বশীল লোকেরাও (যাঁটা টিভিতে মুখপাত্র হয়ে আসেন) লিখতে শুরু করলেন, ‘বিচারপতি বিজেপিতে যাচ্ছেন বলে যে প্রচার হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। অপেক্ষা করুন। দেখতে পাবেন।’ কমেন্ট বক্সে বিচারপতির ঢালাও প্রশস্তি। কেউ কেউ তাঁকে ঈশ্বর বানিয়ে দিলেন। তাঁর হাত ধরে বামেরা ঘুরে দাঁড়াবে, এমন আশার বাণীও শোনা গেল।

কিন্তু যেই না তিনি বিজেপিতে যাবেন ঘোষণা করলেন, অমনি রাতারাতি সুর বদলে গেল। যাঁরা একদিন বা দুদিন আগেও

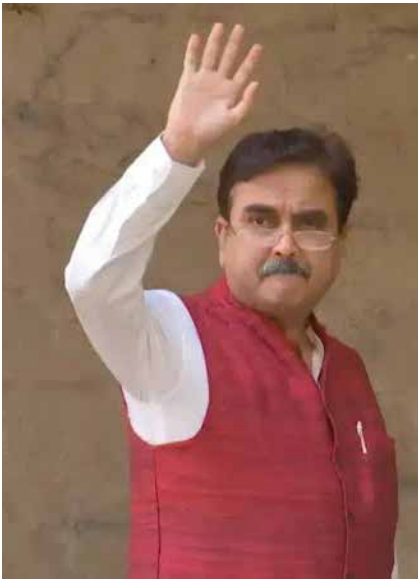

ভগবান বানিয়েছিলেন, তাঁরাই দেখলাম, শয়তান, লোভী, ধান্দাবাজ— এমন বিশেষণ প্রয়োগ করতে লাগলেন। তিনি বামে এলেই ভাল, আর না এলেই তাঁর মতো খারাপ লোক হয় না। এরকম একটা নির্যাস যেন বেরিয়ে এল। এই সুরে সবাই সুর মিলিয়েছেন, এমনটা নয়। কিন্তু এটাই যেন মূলস্রোত হয়ে দাঁড়াল। যে ভাষায় কল্যাণ ব্যানার্জি আক্রমণ করছেন, বামেদেরও কেউ কেউ দেখলাম প্রায় কাছাকাছি ভাষায় আক্রমণ শানাতে শুরু করে দিয়েছেন। মনে পড়ে গেল সেই পুরনো প্রবাদটা— আঙুর ফল টক।

এরই মাঝে মহম্মদ সেলিমের একটা সাক্ষাৎকার শোনার সুযোগ হল। তিনি অকপটেই মেনে নিলেন, ‘বামেরাও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়েও ছিল।’ সরাসরি বামেদের প্রতীকে হয়তো দাঁড়াতেন না। কিন্তু জোট সমর্থিত নির্দল বা এই জাতীয় কোনও মোড়কে তাঁকে নামাতে বামেদেরও আপত্তি ছিল না। বরং, বেশ সম্মতিই ছিল। তাহলে, হঠাৎ এই উল্টো সুরে গাওয়া কেন? হঠাৎ, তাঁর এতদিনের প্রতিবাদী ভূমিকাকে ছোট করে দেখার ও দেখানোর চেষ্টা কেন? এক উঠতি আইনজীবী বলে বসলেন, ‘এরকম একজন লোককে নেওয়া হলে আমি সদস্যপদ ছেড়ে দিতাম।’ গোটা ইন্টারভিউ জুড়ে যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেল, যে নোঙরা ভাষায় আক্রমণ করে গেলেন, মোটেই ভাল লাগেনি। এমনকী বিচারপতি হিসেবে জাস্টিস গাঙ্গুলি কতটা খারাপ, সেটাই যেন প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। এত কীসের আস্ফালন? কী বলছেন, তার কী মানে দাঁড়ায়, এটুকু বোঝার মতো বিচক্ষণতা যাঁর নেই, তিনি কিনা টিভিতে বামেদের প্রতিনিধি! তাঁকে কিনা বিভিন্ন জেলায় বক্তা হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়! তিনি নাকি সম্ভাব্য প্রার্থী!

অভিজিৎ গাঙ্গুলির রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে আপত্তি থাকতেই পারে। তাই বলে তাঁকে এভাবে আক্রমণ করতে হবে? একটু সহিষ্ণুতা, একটু শিষ্টাচার কি আশা করা যায় না? কোথায় থামতে হয়, সেটা এই অর্বাচীনদের শেখানো সত্যিই বড় জরুরি।

বিচারপতিরাই সংশয় দূর করুন

অমিত ভটাচার্য

বিচারপতিদের রাজনীতিতে আসা কতখানি সঙ্গত? সম্প্রতি এই নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আগেও অনেক বিচারপতি অবসর নিয়ে রাজনীতিতে এসেছেন। ভোটে জিতে বিধায়ক বা সাংসদ হয়েছেন। এমনকী মন্ত্রীও হয়েছেন। সম্প্রতি এক বিচারপতিকে দেখা গেল, দায়িত্বে থাকাকালীনই হঠাৎ ঘোষণা করলেন, তিনি রাজনীতিতে আসতে চান। সেই কারণে তিনি পদত্যাগ করতে চান।

দেখা গেল, তিনি পদত্যাগ করলেন। দুদিনের মাথায় একটি দলে যোগ দিলেন। এবং লোকসভায় প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণাও হয়ে গেল। অবশ্য তিনি কোন দলে যোগ দিচ্ছেন, কোন কেন্দ্র থেকে

দাঁড়াচ্ছেন, তিনি নিজে এমনটা ঘোষণা না করলেও অনেক আগেই সেই খবর ছড়িয়ে গেল। এবং দেখা গেল, সেটাই সত্যি।

এই অবস্থায় বিচারপতি হিসেবে তাঁর দেওয়া রায় নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতেই পারে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের ক্ষেত্রেও আমরা দুটি ঘটনা দেখেছি। সরকারের পক্ষে রায় দিয়ে এক বিচারপতি অবসরের পরেই হয়ে গেলেন রাজ্যপাল। আরেক বিচারপতি হয়ে গেলেন রাজ্যসভার সাংসদ। এই নিয়োগ নিয়ে জনমানসে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। তার মানে এই বিচারপতিরা কি পোস্ট রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান আগাম তৈরি রেখেছিলেন। সেই মর্মে রফা করে নিয়েছিলেন?

বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে এটা মোটেই ভাল বিজ্ঞাপন নয়। একজন বিচারপতির বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ উঠবেই বা কেন? বিচার বিভাগ সম্পর্কে এমন সংশয় তৈরি হবেই বা কেন? কীভাবে এই প্রবণতা আটকানো যায়, তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা জরুরি। আমার প্রস্তাব, অবসরের পর 'কুলিং অফ' চালু করা খুব জরুরি। অর্থাৎ, অবসরের পর অন্তত তিন বছর তিনি কোনও নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না। রাজ্যপাল বা অন্যান্য প্রশাসনিক পদে নিয়োগ করা যাবে না। এমনকী কোনও কমিশনের মাথায় বসানো যাবে না। এমনকী কেউ যদি হঠাৎ করে চাকরি ছেড়েও দেন, সেক্ষেwত্রেও তিন বছর অন্তত বিরতি নিতে হবে।

এই ব্যবস্থা যদি চালু হয়, তাহলে বিভিন্ন রায় নিয়ে জনমানসে সংশয় তৈরি হবে না। বিচারবিভাগেরই উচিত এমন আইন প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারের ওপর চাপ তৈরি করা। রাজনৈতিক দলগুলোরও উচিত, এই ব্যাপারে সহমত হওয়া। নইলে শাসক ও বিচারবিভাগ— উভয় বিভাগ সম্পর্কেই সংশয় জোরালো হবে।

ট্রামকে আমরা আদৌ বাঁচিয়ে রাখতে চাই তো!

উত্তম দাস

খুব ঘটা করে পালিত হল কলকাতায় ট্রামের ১৫০ বছর। অর্থাৎ, ঠিক ১৫০ বছর আগে, ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে এই শহরে প্রথম ট্রাম চলেছিল। হ্যাঁ, ঘটা করে পালিত হওয়ারই কথা। কিন্তু কলকাতায় ট্রাম এখন যেন শিবরাত্রির সলতে। বছর দশেক আগেও নাকি ২৬টি রুটে ট্রাম চলত। কমতে কমতে এখন দুটি রুটে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সকলের চোখের সামনে কীভাবে একটু একটু করে ট্রাম হারিয়ে গেল! আমরা বুঝতেও পারলাম না।

সেদিন সকালে আমরা কয়েকজন বেরিয়ে পড়লাম। বলা যায়, পুরনো কলকাতা অভিযানে। ইচ্ছে ছিল, প্রথমে ট্রামে চড়ে খিদিরপুর যাব। সেখান থেকে মেটিয়াবুরুজের ইমামবাড়ায়। বলা ভাল, নবাব ওয়াজেদ আলির সমাধিক্ষেত্রে। অর্থাৎ, এক হেরিটেজে চড়ে আরেক হেরিটেজে।

শীতকালে মাঝে মাঝেই আমরা কয়েকজন এভাবে বেরিয়ে পড়ি। হয়ত হারানো শৈশব, কৈশোরকে খুঁজে বেড়াই। হয়ত সেই ফেলে আসা কলকাতার গন্ধ নিতে যাই। কিন্তু হায়, ধর্মতলায় গিয়ে দেখলাম, ট্রামের দেখা নাই রে, ট্রামের দেখা নাই।

বছর তিনেক আগে বার দুই ট্রামে চড়ে খিদিরপুর গিয়েছিলাম। সেটা মূলত, ভোরের ময়দানকে ট্রাম থেকে দেখার আশায়। ময়দানের সবুজ ঘাসের মাঝ দিয়ে সাতসকালে ট্রাম ছুটে চলেছে। এ এক অন্য মাদকতা। যাঁরা বোঝেন, তাঁরা বোঝেন। তখনই শুনেছিলাম, ট্রাম ডিপোতে নাকি সংস্কার চলছে। তাই এখন ট্রাম ধরতে হবে শহিদ মিনার থেকে। তাই সই। শহিদ মিনার থেকেই ট্রাম ধরেছিলাম।

তারপর লকডাউনের চোখরাঙানি। গণপরিবহণে বড় এক ধাক্কা। তখনকার মতো ট্রাম বন্ধ রাখাটা হয়ত স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু তারপর তো এক এক করে সবই স্বাভাবিক হয়ে এল। শুধু ট্রামই নিঃশব্দে চলে গেল বাতিলের খাতায়।

ধর্মতলা–খিদিরপুর রুটে কত বছর ধরে ট্রাম চলে আসছে। তা কি চিরতরে অতীত হয়ে গেল?

বেশ রাগই হচ্ছিল। এই শহরের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ট্রাম। ভারতের আর কোনও শহরে আছে বলে জানা নেই। এই গতির দুনিয়ায় সারা শহরজুড়ে ট্রাম চালানো হয়ত সম্ভব নয়। তাই অনেক ব্যস্ত রাস্তায় স্বাভাবিক নিয়মেই ট্রাম উঠে যাবে। কোথাও হয়ত মেট্রো রেলের কাজ হচ্ছে। আবার কোথাও রাস্তায় যানজট তৈরি হচ্ছে। কিন্তু খিদিরপুর যাওয়ার রাস্তা তো বিরাট ব্যস্ত রাস্তা নয়। তাহলে, এই রাস্তায় ট্রাম ছুটতে বাধা কোথায়? তাছাড়া, ট্রাম লাইনের অনেকটাই মূল রাস্তার বাইরে। ফলে, যানজট তৈরি হওয়ার বা রাস্তা খারাপ হওয়ার তেমন আশঙ্কাও নেই। অন্তত এই রাস্তায় কি ট্রামকে বাঁচিয়ে রাখা যেত না?

ট্রাম বন্ধ করে দেওয়া হবে, এমনটা কেউই বলেন না। বারবার আশ্বাস দেওয়া হয়, নতুন রূপে ফিরে আসছে ট্রাম। সবকিছু নাকি আরও ঢেলে সাজানো হবে। কিন্তু একের পর এক রুটের ট্রাম কেমন নিঃশব্দে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। শোনা যায়, অনেক ট্রাম ডিপো নাকি বেসরকারি সংস্থাকে দীর্ঘমেয়াদি লিজে দেওয়া হয়েছে। এভাবে জমিগুলো জলের দরে বিক্রি আর সেখান থেকে মোটা কাটমানির জন্য ট্রামকে আস্তে আস্তে কবরে পাঠানো হচ্ছে না তো? মাঝে মাঝেই প্রশ্ন জাগে, সরকার আদৌ ট্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় তো!

শহিদ কাদরির এই গানটা তোমাদের জন্য

দ্যুতিমান মুখার্জি

৯৬ এর এক শীতের সকাল। রবি-বারের আলসেমি আঁকড়ে, গিরীশ মঞ্চের সিংহভাগ চেয়ার সেদিন ফাঁকা। অনুষ্ঠান শুরু করতে করতে ডাক দিলেন কবিয়াল
‘দিন কাল ভালো নয় বন্ধুরা, আসুন সবাই আরও কাছাকাছি থাকি’।
সুতরাং...
এক লাফে নিজের টিকিটের গায়ে লেখা রো নম্বরটাকে হেলায় ভাসিয়ে দিয়ে, একেবারে সটান দ্বিতীয় সারিতে। এরপর শুধু এ গান ও গান ..কতক্ষণ কে জানে, আদরের নৌকায় ভাসতে ভাসতে একসময় দ্বিতীয় সারি থেকে একটা গলা ছুটে গেল স্টেজের দিকে,
"প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাগর থেকে ফেরা.. ",
মুহূর্তে থেমে গেল সব। একটু নীরবতা, তারপর স্টেজ থেকে গমগম করে উঠলেন নাগরিক কবিয়াল
‘কে বললেন ভাই? উঠে দাঁড়ান তো, মনিশংকর, অডিটোরিয়ামের সব আলো জ্বেলে দাও’...
এক ঘর আলোর সামনে লজ্জায়, ভয়ে পুড়ে যেতে যেতে উঠে দাঁড়িয়েছে এক যুবক। পাশে বসা যুবতীর মুখও তখন শুকিয়ে কাঠ।

‘কোথায় শুনলেন ভাই এ গান?’
‘না, মানে.. ’
স্মিত হাসলেন সুমন।
‘আজ ১৮ বছর পর, গানটা গাইবো’
এরপর শুরু সেই অসামান্য গান দিয়ে আরও একবার কবিতার স্নান! ১৮ বছর! কে বলে? একটা অক্ষর ভুলে যাওয়া নেই, সিন্থে-সাইজারে একটা ভুল সুরে আঙুল পড়ছে না...প্রেমেন্দ্র মিত্র অলক্ষ্যে আবার চোখ মেলে চাইলেন বোধহয়। একটা সময় সেই মহা কাব্যের শেষে, তখনও দাঁড়িয়ে থাকা যুবকের পাশের মেয়েটির দিকে চেয়ে হাসলেন সুমন, ‘আজ শহীদ কাদরির এই গানটা তোমাদের দুজনকে উৎসর্গ করলাম... অনুষ্ঠান শেষে ভেতরে এসো তোমরা দুজন’

তারপর, একসময় ঠিক মেঘ ছেঁড়া তীব্র আলোর মতো, সিন্থেসাইজারে, সুরে, কথায় অডিটোরিয়াম ময় নেমে আসছেন কবীর, সপাট। অক্ষরে অক্ষরে, সোজা মেরুদণ্ডে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে বাংলা আধুনিক গান, সঙ্গে ছায়ার মতো শহীদ কাদরি ...
লজ্জায় রঙিন হতে হতে ছেলেমেয়ে দুটি শুনছে --

‘প্রিয়তমা তোমাকে অভিবাদন,
ভয় নেই এমন দিন এনে দেবো,
দেখো সেনাবাহিনী, বন্দুক নয়,
গোলাপের তোড়া হাতে
কুচকাওয়াজ করবে তোমার সামনে...
’

সেই যুবক যুবতীর দুজনেই আজ পঞ্চাশের দোর গোড়ায়....
তবু আজও, দুজনেই পশ্চিমে সূর্য ঢলে পড়লে, সেই লাল আলোয় পূবের খোঁজ করে। দুটোর রঙই তো লাল। একটা পুরনো জীবনের আঙুলে আঙুল ছুঁয়ে, নতুন জীবন।
জীবন এমনই বন্ধুরা।

যতক্ষণ পারেন ফেসবুক থেকে দূরে থাকুন

ইন্দ্রাণী রাহা

কিছু দিন আগেই ফেসবুকের এক অ্যাপ খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কারণ সেখানে পরিচয় গোপন রেখে অ্যাপাধিকারীকে বার্তা বা মেসেজ পাঠানো যায়।
অ্যাপটির জনপ্রিয়তা লাভ করার দুটি কারণ ১) বার্তা প্রেরণকারীর নিজের পরিচয় গোপন রাখা যায়। ২) বার্তা গ্রহণকারী বা বলা ভালো অ্যাপাধিকারীর বার্তা বা ম্যাসেজ পছন্দ না হলে তিনি স্যোশাল মিডিয়ায় পোস্ট না করতেই পারেন, কেউ এই বিষয়ে কিছু জানতে পারবে না।

স্বাভাবিকভাবেই প্রেম নিবেদন থেকে শুরু করে মান-অভিমান, এমনকী সমালোচনা থেকে শুরু করে ক্ষোভ সবকিছুই উগরে দেওয়ার দারুণ সুযোগ আড়ালে থেকে বা পরিচয় না জানিয়ে, আপামর জনসাধারণ এক-কথায় লুফে নেয়। আর ঠিক এখান থেকেই আপনার অনুভূতিগুলোকে ব্যবহার করে আপনাকে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে স্যোশাল মিডিয়ায় আটকে রেখে কোটি কোটি টাকার মুনাফা ঘরে তুলছে আর এক দল। আপনিও নিজেকে ট্রেন্ডি বা আপডেটেড রাখার জন্য মন ভাসাচ্ছেন চলতি জোয়ারে আর নিজেদের অনুভূতিগুলোকে আলগা করে দিচ্ছেন, নিজের অজান্তেই হারিয়ে ফেলছেন নিজের মনের খেই।

একবারও ভেবে দেখেছেন এই সব সমাজ তথা স্যোশাল মিডিয়া উত্তাল করা অ্যাপ আসলে ঠিক কী উত্তাল করে তোলে...? উত্তরটা হল সাধারণ মানুষ তথা উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েদের মন। ফলস্বরূপ 'ভাল্লাগে না' রোগ, রাতজাগা ও মাঝরাতে ক্ষিদে পাওয়ার বদ অভ্যেস। এবং এই নিয়ে একটি অসাধারণ আত্মতুষ্টি আছে। বর্তমান যুব সমাজের ধারণা, এই সব রোগ

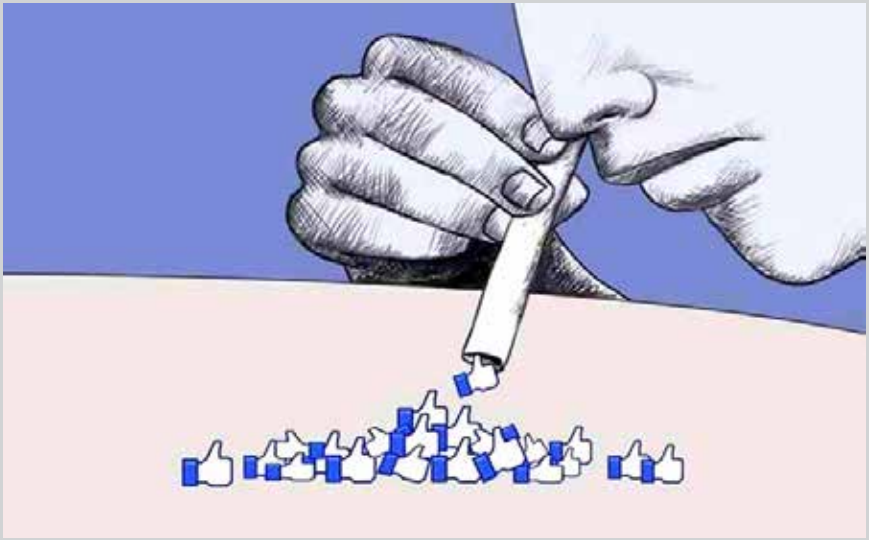

আঁতেল (গালাগালি নয়, বরং কলার তুলে আদিখ্যেতা) হওয়ার লক্ষণ, বুদ্ধিজীবী বা ইন্টেলেক্টদের লাইফ স্টাইল এইরকমই হয়, কারণ তারা ক্রিয়েটিভ বা সৃষ্টিশীল মানুষ। আর এই ক্রিয়েটিভিটির নাম করে মিডিওসিটি বা মধ্যমেধার সস্তা চাটুকারিতা আজ সামাজিক পরণনত মনষ্কতার মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোনও মানুষের প্রতি রাগ, দুঃখ, অভিমান তথা প্রেম বা আসক্তি যা-ই থাকুক না কেন, নিজেকে আড়ালে রেখে নিজের সেই অনুভূতি প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে গেলেন এবং তা স্যোশাল মিডিয়ায় ঢেলে দিলেন। ওদিকে অপরপ্রান্তে থাকা মানুষটি নিজের সুবিধামতো তা প্রকাশ করবেন নিজের প্রতিক্রিয়া–সহ। এবার তা প্রকাশিত হলে আপনার মন আকাশে উড়বে, আর প্রকাশিত না হলে আপনি নে মনে গুমরাবেন। একবারও ভেবে দেখেছেন, এই সমস্ত অনুভূতিগুলো, পরিচয় গোপন করে প্রকাশ করতে হচ্ছে কেন?

আপনার সৎ সাহস নেই? নাকি অনুভূতি গুলির সততা নেই? অর্থাৎ আপনার কারও প্রতি রাগ বা ক্ষোভ আছে, আদৌ সেই রাগ বা ক্ষোভের কোনও উচিত কারণ আছে তো, নাকি সেটা হিংসা? কারোর প্রতি তীব্র অভিমান... আচ্ছা, সেই অভিমান করার মতো অধিকার কি আছে? আপনি চাইলেই তো আর অপ-

রপ্রান্তে থাকা মানুষটির ওপর অধিকার পেয়ে যাবেন না। এক্ষেত্রে তার মতামত কিন্তু সমান গুরুত্ব পায়। আপনার প্রেম বা ভাললাগা অপর মানুষটির কাছে অনধিকার বা অনুচিত হতে পারে!

অপরদিকে এই জাতীয় অ্যাপাধিকারী যিনি আপামর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত পরিসর দিচ্ছেন কারণ তিনি 'নিজের সম্পর্কে জনগণের মনোভাব খোলাখুলি জানতে চাইছেন'— এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। এক্ষেত্রে তিনি নিজের পছন্দমতো বার্তা বা মেসেজ-গুলি বেছে বেছে প্রকাশ্যে আনছেন। এ এক অসাধারণ হিপোক্রেসি। নিজের সমালোচনা গ্রহণ করা বা জনগণের তাঁর প্রতি মনোভাব গ্রহণ করার মতো মানসিক দৃঢ়তা এদের নেই।

এরপর একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন তো, ফেসবুকে আপনার মনের ঠিক কোন দিকটি চর্চিত হচ্ছে ? ঠিক কোন অনুভূতিগুলি প্রাধান্য পাচ্ছে...? ফেসবুকে পাতার পর পাতা জুড়ে গোপন হিংসা, হীনমন্যতা, ভন্ডামি থেকে অনধিকার বা অনুচিত চাহিদার চর্চা চলছে। দিনের শেষে আপনার নিজের মানসিক সুস্থতার দায় কিন্তু আপনারই।

অ্যাপ দু-দিন এসে আপনার অনুভূতি গুলি ব্যবহার করে কোটি কোটি মুনাফা লুটে চলে যাবে। দিনের শেষে আপনার ভুল/ খারাপ অনুভুতি বা নেগেটিভ ইমোশনস্ গুলো নিয়েই তাদের ব্যবসা। ব্যবহৃত হচ্ছে আপনার মন, আপনার অনুভূতি আর আপনার ডিপ্রেশন বা ভাল্লাগেনা নামক মারাত্মক রোগটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। মজার ব্যাপার হল, আপনি যত ডিপ্রেশন বা 'ভাল্লাগে না' রোগে ভুগবেন, তত এই সমস্ত অ্যাপ এর পাল্লায় পড়বেন। আর তত এদের বাড়-বাড়ন্ত হবে। এক কথায় ফেসবুক থেকে লগ-আউট হয়ে যান। যতক্ষণ পারেন ফেসবুক থেকে দূরে থাকুন।

স্মৃতিটুকু থাক

আর জানাই হল না

আমি তখন কবিতার পাশাপাশি গানও লিখছি। কেমন হচ্ছে, জানি না। নিজের মনে হল, ভালই হচ্ছে। কিন্তু কাকে দিয়ে গাওয়ানো যায়! দু–একজন শিল্পীকে ফোন করলাম। তাঁরা তেমন পাত্তাই দিলেন না। কেউ বললেন, অজানা লোকের গান গাই না। কেউ বললেন, পুজোর রেকর্ড হয়ে গেছে। কেউ বললেন, এবার আধুনিক নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীত করব। একমাত্র একজন দারুণভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি পিন্টু ভট্টাচার্য। বাড়িতে ডাকলেন। গেলাম। হাতে ক্রাচ নিয়ে অনেক কষ্ট করে নিজের গানের ঘরে এলেন। গানগুলো দেখলেন। বললেন, বাহ্, বেশ। আমি যদি ভাল সুর করতে পারি, নিশ্চয় গাইব। তিনি বললেন, আমার কোনও গান জানো! গাইলাম, শেষ দেখা সেই রাতে, জানি না কখন যে সে, এক তাজমহল গড়ো। তাঁর দুচোখ দিয়ে তখন জল গড়িয়ে আসছে। বললেন, আজ খেয়ে যেও। তার কয়েকমাস পরেই পেলাম তাঁর মৃত্যু সংবাদ। আমার গানগুলো সুর করেছিলেন কিনা, আর জানাই হল না।

প্রত্যুষ মিত্র, বেলগাছিয়া

ক্ষমা চাইছি

আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র আমার কাছে ব্যাট, বল, উইকেট ছিল। আমার কাকা কিনে দিয়েছিল। কিন্তু আমি যে খুব ভাল ক্রিকেট খেলতে পারতাম, এমন নয়। আবার যেহেতু আমার ব্যাট, উইকেট, তাই আমাকে দলেও নিতে হত। আমার আবদার ক্রমশ বেড়ে গেল। প্রথম দিকে আমি আউট হলেই ব্যাট, উইকেট বগলদাবা করে চলে আসতাম। বাকিদের আর ব্যাট করা হত না। পরের দিকে আমি শর্ত দিলাম, আমাকে দুবার আউট করতে হবে। বন্ধুরা তাই মেনে নিল। আমাকে শুরুতে বল দিতে হবে। তা–ও মেনে নিল। তখন ব্যাপারটায় বেশ মজা পেতাম। হয়ত কিছুটা অহঙ্কারও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এখন যখন সেই বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়, খুব লজ্জা পাই। ব্যাট, উইকেট আছে বলে এমন অন্যায় আবদার করা আমার উচিত হয়নি। ওরা হয়ত ভুলেই গেছে। কিন্তু আমি কী করে ভুলি? ছেলে বেলার সেই আচরণের জন্য আজ ওদের সবার কাছে ক্ষমা চাইছি।

অনিন্দ্য ব্যানার্জি, বহরমপুর

স্মৃতিটুকু থাক

আরণ্যকের সেই দোবরু পান্না

একবার হোলির সময় আমরা কয়েক-জন বন্ধু দল বেঁধে বেড়াতে গিয়েছিলাম গালুডি। ঘাটশিলা পেরিয়ে সেই গালুডি খুব সুন্দর জায়গা। কুলকুল করে বয়ে চলেছে সুবর্ণরেখা। নদীর পাড়েই মহুয়া খাচ্ছিল একদল আদিবাসী। আমাদেরও ইচ্ছে হল, একটু মহুয়া খাই।

একজন আদিবাসী কাকাকে বললাম, আমাদের একটু মহুয়া দেবে! সেই কাকা বলল, আপনারা খাবেন? আমি বললাম, কেন খাব না? কাকা বলল, আমার সঙ্গে আসুন। বলেই হনহন করে হাঁটতে শুরু করল। প্রায় দু কিলোমিটা-রের মতো পথ। সে বকবক করে গেল। মহুয়ার ঘোরে বলে যাচ্ছিল, হালকা চালের কথা, কিন্তু অধিকাংশ কথার মধ্যে এক গভীরতা লুকিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, যেন এক দার্শনিকের সঙ্গে হাঁটছি। মনে মনে নামকরণ করে ফেললাম, দোবরু পান্না। হ্যাঁ, আরণ্যকের সেই দোবরু পান্না।

নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাদের মহুয়া খাওয়াল। একটা বোতলে করে মহুয়া ভরেও দিল। টাকা দিতে গেলাম। কিছুতেই নিল না। বলল, আপনারা মহুয়া খেতে চেয়েছেন, এ তো আমার সৌভাগ্য, এর জন্য টাকা নেব কেন! সেই কাকার আসল নাম আর মনে নেই। কিন্তু হোলি এলেই আমাদের সেই দোবরু পান্নার কথা খুব মনে পড়ে।

দেবাশিস মণ্ডল, গড়িয়া

বেড়াতে গিয়ে বা অন্য কোথাও আপনি কি এমন কোনও মানুষের সন্ধান পেয়েছেন? লিখে পাঠাতে পারেন তাঁর কথা। লেখা পাঠানোর ঠিকানা

bengaltimes.in@gmail.com

ওপেন ফোরাম

অহেতুক জটিলতা বাড়াচ্ছে রেল

সৌম্যজিৎ চৌধুরি

সহজ কাজকে কীভাবে জটিল করতে হয়, তা বোধ হয় ভারতীয় রেলকে দেখে শিখতে হয়। অনেকেই আইআরসিটিসি থেকে টিকিট কাটেন। যাঁরা আগে কেটেছেন, তাঁরা যদি এখন সেই সাইট খোলেন, চিনতে পারবেন না। সংস্কারের নামে, আপগ্রেডেশনের নামে অহেতুক কিছু জটিলতা বাড়ানো হয়েছে। ফলে, টিকিট কাটা মানে বিরাট এক ভোগান্তি।

রেলের সঙ্গে অনেককিছু জুড়েছে। বিমানের টিকিট যুক্ত হয়েছে। ওলা ক্যাবের পরিষেবা চালু হয়েছে। ই ক্যাটারিং যুক্ত হয়েছে। রেল আবার প্যাকেজ ট্যুরেও হাত দিয়েছে। চাইলে নিজে পুরো ট্রেন ভাড়াও নিতে পারেন। হোটেল বুকিং করতে পারেন। সবমিলিয়ে নানা কর্মকাণ্ড। কিন্তু একশো জন টিকিট কাটলে এগুলো কজনের দরকার হয়? অধিকাংশ যাত্রী শুধু টিকিটই কাটেন। তাই তাঁরা যেন কম ঝামেলায় টিকিট কাটতে পারেন, সেটাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত। তার বদলে তাদের জটিলতা অনেক বেড়ে গেছে। আগে সহজেই টিকিট কাটা যেত, এমনকী যাঁরা ইন্টারনেটে তেমন সড়গড় নন, তাঁরাও সহজে টিকিট কাটতে পারতেন। তার বদলে আরও হাজার গন্ডা পরিষেবা সামনে আনতে গিয়ে আসল কাজটাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইসঙ্গে যোগ হয়েছে বিজ্ঞাপনের উটকো উৎপাত। নানারকম উইন্ডো খুলে যাচ্ছে। ভুল করে ক্লিক করলেই সর্বনাশ। আসল জায়গা থেকে সরে গিয়ে আপনি বিজ্ঞাপনের ভুলভুলাইয়ায় ঢুকে পড়লেন।

যাঁরা নানারকম পরিষেবা চান, তাঁরা জানেন কোথায় গেলে পাওয়া যায়। তাঁরা অনেকটাই টেক স্যাভি। কিন্তু যাঁরা সাধারণ যাত্রী, তাঁদের অকারণ ভোগান্তির মধ্যে না ফেলাই ভাল। রেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আইআরসিটিসি সাইটটিকে দয়া করে আগের চেহারায় ফিরিয়ে দিন। এই জটিলতা থেকে মুক্তি দিন।

ডার্বি নিয়ে চিঠি নেই, বিবৃতিও নেই

অজয় নন্দী

ধরা যাক, তৃণমূলের কোনও সমাবেশ ডাকা হয়েছে। এবং যেমন তেমন সমাবেশ নয়, একেবারে ব্রিগেড সমাবেশ। তার অনেকদিন পর, সেই একইদিনে আইএফএ চাইছে ডার্বি আয়োজন করতে। এখন ডার্বির দিন তো আর দুম করে ঘোষণা করে দেওয়া যায় না। পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। সেইদিনে প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া যাবে কিনা, তা নিশ্চিত করতে হয়। তারপর ঘোষণা। এখন শাসক দলের ব্রিগেড সমাবেশ আছে, এটা জানার পর সেইদিন পুলিশ কি ডার্বি আয়োজনের অনুমতি দিত? নিশ্চিতভাবেই না।

কিন্তু উল্টোটা যদি হয়! ধরা যাক, আগে ডার্বির দিন ঘোষণা হল। তার অনেক পরে, কোনও এক যুবরাজের খেয়াল হল, তিনি ব্রিগেড ডাকবেন। সেক্ষেত্রে কী হবে? কী আবার হবে? তাঁর তো অনুমতি চাওয়ার কোনও দরকার নেই। প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করারও দরকার নেই। তিনি ধরেই নিয়েছেন, তাঁর কথাই আইন। তিনি যেদিন করতে

চাইবেন, সেদিনই করবেন। সেইদিন শহরে অন্য কী আছে, সেসব ভাবার দায় তো তাঁর নেই।

হ্যাঁ, পুলিশকে এতখানি তুচ্ছতাচ্ছিল্যই করেন ভাইপো। তিনি জানেন, তাঁর পিসির সরকার। এই সভার অনুমতি দেবে না, পুলিশের ঘাড়ে দুটো মাথা নেই। এবার পুলিশ পড়ল সমস্যায়। কারণ, ডার্বির অনুমতি দেওয়া আছে। দিন ঘোষণাও হয়ে গেছে। এখন ভাইপোকে তো আর বলা যাবে না যে, আপনি ব্রিগেডের ডেট পিছিয়ে দিন। অতএব, দুই ক্লাবের ওপরই চাপটা এল। আপনারা ডার্বির দিনটা অদল বদল করুন। ক্লাবগুলিও অসহায়। না, আমরা ওইদিনই খেলব, এমনটা বলার মুরোদ নেই। থাকার কথাও নয়। দাঁত কেলিয়ে শাসকদলের সভায় হাজির হলে এমন কান মলা তো মাঝে মাঝে খেতেই হবে। আইএফএ থেকে শুরু করে ফেডারেশন, সবাই যেন অসহায়। আগে শাসকদলের মানরক্ষা। তারপর অন্যকিছু।

কখনও শোনা গেল, ডার্বির দিন এগিয়ে যাবে। কখনও শোনা গেল, ভিন রাজ্যে চলে যাবে। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী এমনতি প্রচারের ফুটেজ খেতে সব ব্যাপারেই আসরে নেমে পড়েন। কিন্তু এক্ষেত্রে বুঝতে পারছেন না, কী পরামর্শ দেবেন। যদি তিনি রেগে যান! অতএব, তিনিও মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইলেন। ক্রীড়ামন্ত্রী থেকে ক্রীড়া প্রশাসন, দুই ক্লাব— সবাই কতটা অসহায়, এই একটা সিদ্ধান্ত যেন আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। অবশেষে সমাধানসূত্র বেরোলো। ডার্বি সেইদিনই হবে, সময়টা পিছিয়ে যাবে। এত রাতে দর্শকরা বাড়ি ফিরবেন কীভাবে, তা নিয়ে বেশি ভেবে লাভ নেই। হচ্ছে, এই ঢের। এর বেশি ভাবতে গেলে জটিলতা বাড়বে বই কমবে না।

দুই ক্লাবের কর্তারা এত কথায় কথায় প্রতিবাদ করেন, চিঠি লেখেন। এক্ষেত্রে কোনও চিঠি নেই, বিবৃতি নেই। ইস্টবেঙ্গলের স্পনসর

ভাইপোকে তো আর বলা যাবে না যে, আপনি ব্রিগেডের ডেট পিছিয়ে দিন। অতএব, দুই ক্লাবের ওপরই চাপটা এল। আপনারা ডার্বির দিনটা অদল বদল করুন। ক্লাবগুলিও অসহায়। না, আমরা ওইদিনই খেলব, এমনটা বলার মুরোদ নেই। থাকার কথাও নয়। দাঁত কেলিয়ে শাসকদলের সভায় হাজির হলে এমন কান মলা তো মাঝে মাঝে খেতেই হবে।

নাকি মুখ্যমন্ত্রী এনে দেন। মোহনবাগানের নাম নাকি মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করে দেন। আইএফএ–র সভাপতির নাম অজিত ব্যানার্জি। মোহনবাগানের ফুটবল সচিবের নাম বাবুন ব্যানার্জি। একজন মুখ্যমন্ত্রীর দাদা, অন্যজন ভাই। এদিকে, সভা ডেকেছেন ভাইপো। একটা পরিবারের খামখেয়ালিপনা। কিন্তু ভুগতে হবে খেলার মাঠকে। গর্জে ওঠা ময়দান আর বড় বেশি নিশ্চুপ।

ফিরে দেখা

আশির দশক

কিশোর মনে ঝড় তোলা সেই ‘শত্রু’

বেঙ্গল টাইমসের জনপ্রিয় বিভাগ আশির দশক। উঠে এল তখনকার একটি হিট ছবির কথা। সেই ছবিকে ঘিরে অনেক নস্টালজিয়ার কথা। শিশুমনে কত প্রশ্ন ও মুগ্ধতার কথা। লিখেছেন সুমিত চক্রবর্তী।।

কোন ছবির কে পরিচালক, কে চিত্রনাট্যকার, এসব বোঝার মতো বয়স তখন হয়নি। সদ্য বেড়ে ওঠা। শৈশব ছাড়িয়ে কৈশোরেও তখনও আসিনি। তখন যে নায়ক, তারই সিনেমা। আড়াল থেকে কে গাইছে, জানার দরকার নেই। সিনেমায় যাকে দেখাচ্ছে, এটা তারই গান। কী সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো। কোন সিনেমার কী বার্তা, কোন দৃশ্য কতটা রোমান্টিক, এসব বুঝতে বয়েই গেছে। যে সিনেমায় যত মারপিট, সেই সিনেমা তত ভাল।

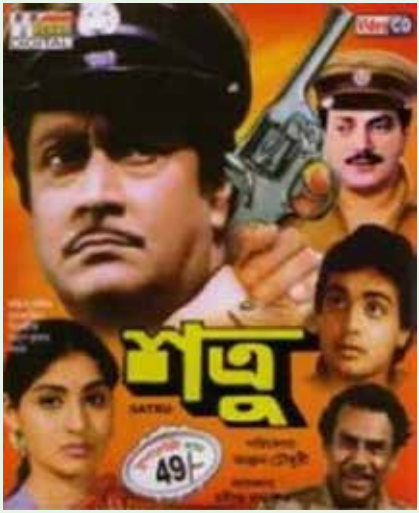

আশির দশক। মফসসলে তখনও হিন্দি সেভাবে জাঁকিয়ে বসেনি। এমনকী ভিডিও হল সংস্কৃতিও সেভাবে গড়ে ওঠেনি। সিনেমা বলতে শহরের সিনেমা হল। আর স্কুলে তিন চারদিনের পর্দা টাঙিয়ে ছবি দেখানো। সে অর্থে বলতে গেলে, আমার মনে প্রথম দাগ কাটা ছবি শত্রু। তখন কে অঞ্জন চৌধুরি, চিনতাম না। আমার কাছে শত্রু মানে রঞ্জিত মল্লিক। এক সৎ ও সাহসী পুলিশ অফিসার। সেই ছবিতে চিরঞ্জিৎ ছিলেন, প্রসেনজিৎও ছিলেন। কিন্তু আমার মনজুড়ে একজনই রঞ্জিত মল্লিক। সেই ছবিটা দেখেই পুলিশকে সম্মান করতে শিখেছিলাম। দৈনন্দিন নানা ঘটনায় পুলিশ সম্পর্কে ধারণা খারাপ হয়। তবু এখনও যে বিশ্বাসটা তলিয়ে যায়নি, তার একটা বড় কারণ শত্রু। মনে হয়, শুভঙ্কর সান্যালের মতো দারগা হয়ত এখনও আছেন।

তখন থেকেই রঞ্জিত মল্লিক আমার প্রিয় নায়ক। এই হ্যাংওভারটা তার পরেও আরও বছর পনেরো ছিল। রঞ্জিত মল্লিকের প্রায় সব ছবিই দেখেছি। মনে হত, এই লোকটা খারাপ হতে পারে না। একজন আদর্শবান লোক বললেই এই মুখটা ভেসে উঠত।

মনে রাখার মতো সব সংলাপ। হাততালি দিতাম। তখন মনে হত, এগুলো রঞ্জিত মল্লিকই বলছেন। পরে বুঝলাম, ওই সংলাপগুলো অঞ্জন চৌধুরির লেখা। ওই ছবিতে প্রসেনজিৎ ছিল গুন্ডা টাইপের। তাই পরে প্রসেনজিতের যত ভাল ছবিই দেখি, ওই ছবি একটা অন্যরকম ধারনা গড়ে দিয়েছিল। মনে হত, এই লোকটা খুব খারাপ। ছবিতে চিরঞ্জিৎও ছিলেন সৎ পুলিশের ভূমিকায়। হয়ত তাই তাঁর প্রতিও একটা আলাদা দুর্বলতা রয়ে গেছে।

মহুয়া রায়চৌধুরি। আশির দশকে আমার আরেক প্রিয় চরিত্র। কী মিষ্টি মুখটা! খুব কাছের মনে হত। হঠাৎ শুনলাম, আগুনে পুড়ে তাঁর নাকি মৃত্যু হয়েছে। সেটা কি চলে যাওয়ার বয়স ছিল! আশির দশকে মন ভারাক্রান্ত করার মতোই একটা ঘটনা। ছবির কথায় ফিরি। মন কেমন করে দেওয়া একটা গান ছিল— বল না গো, কার মা তুমি/ কোথায় তোমার ছেলে। গানটা পরে অনেকবার শুনেছি। যতবার শুনেছি, চোখ ছলছল করে উঠেছে। ছোট্টু নামে একটা ছেলের লিপে গানটা ছিল। আমি জানতাম, এটা ছোট্টুরই গান। বলতাম, ছেলেটা কী ভাল গান গায়! পরে জানলাম, ওটা নাকি আরতি মুখার্জির গান। ছেলের গলায় মেয়ের গান! এমন কত বিস্ময় যে তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, সেই ছোট্টু। আসল নাম মাস্টার তাপু। আরও দু একটা ছবিতে টুকটাক কাজ করেছে। তারপর ছেলেটা কোথায় যে হারিয়ে গেল! কেউ কি সন্ধান দিতে পারেন!

(বেঙ্গল টাইমসের জনপ্রিয় বিভাগ— ফিরে দেখা। ফেলে আসা সময়ের নানা ঘটনা, নানা অনুভূতি ও চরিত্র উঠে আসতে পারে এই ফিচারে। এবার উঠে এল আশির দশকের একটি জনপ্রিয় সিনেমা ও তাকে ঘিরে তখনকার ভাবনার কথা। এমন নানা বিষয় নিয়ে আপনিও লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা: bengaltimes.in@gmail.com)

ফিরে দেখা

আশির দশক

টিভিতে দেখা, স্বপ্নে দেখা সেই রাজকন্যা

ময়ূখ নস্কর

সরোবরের জলে সাঁতার কাটছে একটি রাজহংসী। হঠাৎ সে গলা বাঁকিয়ে দিকবদল করল। শব্দ হল না। ঢেউ উঠল না। একটা পালকও বাঁকল না। শুধু জলের ওপরে কয়েকটা রেখা আঁকা হয়ে গেল। দেখেছেন এমন দৃশ্য? দেখে কী মনে হয়েছে? সরস্বতী ঠাকুরের কথা? দূর মশাই, তাহলে আপনি আশির দশকে কৈশোর কাটাননি।

এখন আপনার বয়স কত? চল্লিশ পেরিয়েছে? আকাশে লঘুভার সাদা মেঘ দেখে আপনার কী মনে হয়? কী মনে হয় এলোমেলো হাওয়ায় কাশফুলের ওড়াউড়ি দেখে? শরৎকাল, দুর্গাপুজো? দূর, তাহলে আপনি স্টেফি গ্রাফ বলে কাউকে দেখেননি। দেখেননি তাঁর সাদা স্কার্টের ছন্দময় ওড়াউড়ি।

আটের দশক। ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ছে টিভি। সাদা কালো, তবু তার দৌলতেই বাইরের পৃথিবী উকিঝুকি মারছে বাঙালির ঘরে। পা রাখছে টেনিস নামক এক ভিনদেশি খেলা। বিটকেল তার নিয়ম কানুন। পনেরোর পরে তিরিশ, তারপরেই চল্লিশ। ডিউজ, অ্যাডভান্টেজ, ডাবল ফল্ট, আনফোর্সড এরর– বোঝা যায় না, কিছুই বোঝা যায় না।

তবুও এই না বোঝার মধ্যেই জার্মানি থেকে উঠে এল দুটি ছেলে-মেয়ে। একজন ফুটবলের গোলকিপারের মতো ড্রাইভ দেয়–সদ্য কৈশোর ছাড়ানো বরিস বেকার। আরেকজন স্টেফি গ্রাফ। তাঁর টিকালো নাক, তাঁর পনিটেল, সে জিতলেও কাঁদে, হারলেও কাঁদে। সেই প্রথম জানলাম, আনন্দেও কাঁদা যায়।

জার্মানি বললাম বটে। কিন্তু আসলে পশ্চিম জার্মানি। পৃথিবীর মানচিত্র তখন অন্যরকম

ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনও মধ্যাহ্ন সূর্যের তেজে জ্বলছে। জার্মানির পূর্বে সমাজতন্ত্র, পশ্চিমে ধনতন্ত্র। মাঝে বিশাল এক পাঁচিল। ভারতীয়রা মনেপ্রাণে জানে, সোভিয়েত আমাদের বন্ধু। বাংলা তখন লালে লাল।

কিন্তু কী বিস্ময়, কী বিস্ময়। ধনতন্ত্রী পশ্চিম জার্মানির এক মেয়ের জন্য আকুল হল আমার সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে থাকা মন। চেকোস্লাভাকিয়ার মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা, যুগোস্লাভিয়ার মনিকা সেলেস–কমিউনিস্ট দেশ থেকে উঠে আসা দুই মেয়ের বদলে সমর্থন করলাম হিটলারের দেশের মেয়েকে। প্রেম আর কবে তত্ত্বকথা মানে!

হ্যাঁ, প্রেম। কৈশোরের প্রেম। ইংরেজিতে যাঁরে বলে ইনফ্যাচুয়েশন। কে শ্রীদেবী, কে মাধুরী, কে জুহি চাওলা! আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে ব্ল্যাক ফরেস্ট আর রাইন নদীর পারে। বন্ধুরা সিনেমা দেখে, সলমন–ভাগ্যশ্রী, কবুতর যা যা যা। আমি উইম্বল্ডন দেখি। দেখি সবুজ ঘাসে এক সফেদ কবুতরি উড়ে বেড়াচ্ছে, ছুটে বেড়াচ্ছে। নিখুঁত ফার্স্ট সার্ভে উড়ে যাচ্ছে তাঁর পনিটেল। যেন স্বর্ণালী শস্যগুচ্ছ। ফোরহ্যান্ডের মসৃণ পেলবতায় জার্মানি তরুণীর স্কার্ট যেন ইরানি কিশোরীর ঘাঘরা–ঘূর্ণি হাওয়ায় দোলে।

আশির দশক পেরিয়ে নব্বই এল। সোভিয়েত ইতিহাস হয়ে গেল। এক হয়ে গেল দুই জার্মানি। আর আমার ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ল। মানে, স্কুল ব্যাগ থেকে একগাদা স্পোর্টসস্টার বেরিয়ে পড়ল। তার সবগুলোতেই ছিল স্টেফি গ্রাফের ছবি। একটা বই চুরি গিয়েছিল। কে চুরি করেছিল, জানতে পারিনি। স্কুলের বন্ধু বাপ্পাদিত্য খুব সাহায্য করেছিল। টিফিন টাইমে সবাই যখন মাঠে, আমি আর বাপ্পাদিত্য সবার ব্যাগ খুলে খুলে সার্চ করেছিলাম। চোরাই মাল পাওয়া যায়নি।

নতুন শতাব্দী এল। বিশ্বাসঘাতিনী স্টেফি বিয়ে করল আগাসিকে। এবং লজ্জা– ঘেন্নার মাথা খেয়ে বাচ্চা–কাচ্চার জন্মও দিল। আমিও মনের ব্যথা মনে চেপে খাঁটি বাঙালি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে উদ্যোগী হলাম।

এরপরেও কয়েক বছর কাটল। স্কুলের রি–ইউনিয়নে আবার দেখা হল বাপ্পাদিত্যর সঙ্গে। কথায় কথায় উঠল আমার স্টেফি প্রেমের কথা। উঠল আমার সেই বই চুরির কথা। বাপ্পাদিত্য হাসতে হাসতে বলল, বইটা আসলে সে–ই চুরি করেছিল। সবার ব্যাগ সার্চ করা হলেও তার ব্যাগটাই আমি সার্চ করিনি।

হৃদয় কী বিচিত্র। বাপ্পাদিত্যর হাসিতে আমিও হো হো করে যোগ দিলাম। অথচ, আটের দশকে হলে তার সঙ্গে আমার হাতাহাতি অবশ্যম্ভাবী ছিল।

ঝটিকা সফরে সান্দাকফু আর সেই বীরেনভাই

রুদ্র চক্রবর্তী

ঘুরে এলাম দার্জিলিং। হয়ত অনেকে বলবেন বাঙালির দিপুদার ভ্রমণে এমন কি আর নতুন কথা? কিন্তু কিছু কথা না বললে যে নয়।

দীর্ঘ দু বছর পরে কোথাও যাবার কথা যখন ভাবলাম তখন বাচ্চাদের দীপাবলির ছুটিটাকেই বাছতে হল। এই অল্পদিনে ঘুরে আসার জন্য দার্জিলিং বেশ উপযুক্ত মনে হল। গোল বাঁধলো থাকব কোথায়? সঙ্গে ছিলেন আমার সত্তরোর্ধ শাশুড়ি, যার

পক্ষে বেশি ওঠা বা সিড়ি ভাঙ্গা মুশকিল। মুশকিল আসান হিসাবে অবতীর্ণ হলেন একটি ফেসবুক গ্রুপের বন্ধুরা। এতজন তাদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে সাহায্য করতে চাইলেন যে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি রইল আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

আমরা ছিলাম হোটেল বেলভিউতে। এই হোটেলটি একদম ম্যাল এর উপর, রুমগুলো রীতিমতো বড়, রুম নম্বর ৩৭ যে কোনও স্টার হোটেলে সুইটের চেয়ে ছোট নয় হলফ করে বলা যায়। ভাড়া খুব বেশি নয়, স্টাফদের ব্যবহার খুবই হেল্পফুল। ফোয়ারার ঠিক পিছনের প্রায় লাগোয়া হোটেল। তবে রাজকীয় আতিথেয়তা আশা করা ঠিক নয়।

এবার দার্জিলিং এর লোকাল কিছু জায়গা। গ্লেনারিজ ফোটো তোলার ভাল জায়গা, over hyped লেগেছে এছাড়া। এর চেয়ে ভাল কেক অনেক সস্তায় আমাদের মুর্শিদাবাদে মেলে। আর কেভেন্টারে শুধু ব্রেকফাস্ট মেলে, খেয়ে দেখা হয়নি (লোকের কাছে কি আর্ আমায় পাতে দেওয়া যাবে ফ্র্যান্দস?)

আমাদের দার্জিলিং ভ্রমণের হাইলাইট ছিল সম্পূর্ণ বিনা প্ল্যানে ঝটিকা সফরে সন্দকফু ভ্রমণ। ভাল কথা, ভাইফোঁটার দিনে দার্জিলিং বেড়াতে এলে ঘরবন্দি হয়ে থাকতে হতে পারে! তাই কোথায়

যাই ভাবতে ভাবতে হঠাৎই মানেভঞ্জন গমন, সেখানেই বিনা কিছু ভাবনায় সান্দাকফুর গাড়ি চড়ে বসা বিকেল বিকেল ঘুরে আসব ভেবে।

কখনও সান্দাকফু গিয়ে সেদিন ফিরবেন না। রাস্তা অতি দুর্গম, বিশেষ করে গৈরিবাসের পর থেকে। বিকেল চারটেয় চারদিক প্রায় অন্ধকার, হাড়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে মাইনাস টেম্পারেচার! অগত্যা, ঠিক হল রাত সান্দাকফুতে কাটিয়ে পরদিন ভোরে প্রত্যাবর্তন।

সন্দাকফুতে থাকার জন্য একটিই হোটেল আছে (অন্তত আমার চোখে পড়ল) - হোটেল সানরাইজ। কমোডের ফ্ল্যাশ কাজ করে না। কোনও রুম সার্ভিস নেই, খুবই বেসিক, কিন্তু পজিশন এবং পজিশন!
হাড় কাঁপানো শীতে ঘুম ভাঙল অ্যালার্মের শব্দে। ছাদে গিয়ে দেখলাম অলরেডি সেখানে অনেক লোক।
আর কী দেখলাম? কপালকুন্ডলার নবকুমার এর মতো বলতে ইচ্ছে করছে, ‘আহা কি দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না’ ! দেখলাম আদিগন্ত বিস্তারে শয়নরত বুদ্ধদেব, আর্ তাঁর হৃদয়ে বিরাজমান কাঞ্চনজঙ্ঘা!

সব গ্লানি, সব পথ কষ্ট গেল দূর হয়ে! আব্রাহাম মাস্লো বর্ণিত সেই "আহা" অনুভূতি - সব ক্ষুদ্র দুঃখ বেদনা সব নিঃশেষে বিলীন! ফেরার পথে গল্প হচ্ছিল আমাদের এই কদিনের ড্রাইভার বীরেনের সঙ্গে। বীরেন রাই - মাঝবয়সী অবিবাহিত এক নেপালি যুবক, বৃদ্ধা মাকে নিয়ে থাকেন কালিম্পং এর কাছে এক গ্রাম পেদঙে। কথায় কথায় সদাহাস্যময় বীরেন বলে চলেন তাঁর জীবন দর্শনের কথা। কীভাবে তিনি তাঁর উপার্জনের একটা বড় অংশ বিলিয়ে দেন প্রতি মাসে বিভিন্ন বৃদ্ধাশ্রমে, কীভাবে তিনি বিভিন্ন পরিবার থেকে অপাংক্তেয় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সেবা করে আনন্দ পান। তাঁদের আশীর্বাদ তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ যেটা তাঁর বিরাশি বছরের মায়ের পরমায়ু বাড়ায় এই বিশ্বাস। ভ্রমণ শেষে ট্রেনে উঠে কানে বাজে তার কথা, ‘দো দিন কা জিন্দেগি হ্যায় সাব, বিন্দাস রহনা। কেয়া করেগা উতনা কামাকে? কাল সে ফির মেরা গাড়ি বন্ধ, ফির জব তক মন নেহি হোগা।’

আকর্ণ হাসতে থাকেন বীরেন। ট্রেন ছেড়ে দেয়। দার্জিলিং রয়ে যায় স্মৃতিতে ।

(পুনশ্চ: বীরেনকে প্রশ্ন করেছিলাম ওর নম্বর এই লেখায় দিতে পারি কিনা। রাজি হল না। বীরেনরা হয়ত এরকমই একটু খেয়ালি হয়। যে ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে ওর নম্বর পাওয়া, তিনিও ওঁর এই খেয়ালি স্বভাবের কথা আগেই বলেছিলেন।)

শিমুলতলা একবারই আসে জীবনে

জয়দীপ চক্রবর্তী

‘উৎসব শেষ। সামনে এখন হু হু শীত। দিন ফুরিয়ে যায় সহজে। তারপর মন খারাপ করা সন্ধে-রাত। সেই রাত যত গভীর হয়, তত যেন এক শূন্যতা বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে মিশে যেতে থাকে সেই মহাশূন্যে।

এমন শীত-শীত রাতে কত কথা মনে পড়ে। সেই ছেলেবেলা, সেই কলেজ-বেলা, সেই সব বন্ধুবান্ধব...

মনে পড়ে এমনই এক শীতে গিয়ে-ছিলাম শিমুলতলা। তখন যাদবপুরে পড়ছি। শিমুলতলার রুখু প্রান্তর, জোনাকি ভরা অন্ধকার মাঠ মনে ঘোর লাগিয়ে দিয়েছিল।

ভেবেছিলাম, আবার একদিন আসব। একা একা ঘুরব চারপাশে।

কিন্তু আর যাওয়া হয়নি। প্রতিবার শীত এলেই শিমুলতলার সেই প্রান্তর, সেই অন্ধকার দেখতে পাই। ভাবি, যাব। একদিন নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই যেন যাওয়া হয় না। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়! এখন বুঝি, শিমুলতলায় কখনও যাওয়া যায় না। শিমুলতলা একবারই আসে জীবনে। সেই স্মৃতি এবং ফেরার স্বপ্ন নিয়েই জীবন কেটে যায়।'

ওপরের লেখাটা কপি পেস্ট করা। হাল আমলের নাম করা ঔপন্যসিক ও ছোট গল্পকার এবং 'আনন্দমেলা' পত্রিকার সম্পাদক সিজার বাগচীর ফেসবুক পেজের একটি লেখা। মনকে দূরে কোথাও দূরে দূরে নিয়ে যেতে পারা লেখার জন্য সিজার বাগচীর প্রসিদ্ধি।

এখন প্রশ্ন, হঠাৎ এই লেখাটা নিলাম কেন? লেখাটা পড়ে দেখুন ভাল করে। যে জায়গায় ফিরে যাওয়ার জন্য রোমান্টিক আকুতি সেই জায়-গাটার নাম শিমুলতলা।হ্যাঁ, 'দাদার কীর্তি' র সেই শিমুলতলা। কেদার সরস্বতীর সেই অপাপবিদ্ধ প্রেমের অঙ্কুরোদগমের সেই শিমুলতলা।

পপকর্ন-কোল্ড ড্রিংকসের সাময়িক উন্মাদনার বাইরে গিয়ে বাঙালির গভীর প্রেমের স্মারক হয়ে রয়েছে যে শিমুলতলা। বাঙালি প্রেমের সেই সব পেয়েছির দেশ। আজও গভীরতা বিশিষ্ট যে কোনও মেয়েই চায় কেদারের মতো সরল প্রেমিক, যে কোনও ছেলেই চায় বাস্তবের সব রুক্ষতার থেকে নিজেকে জুড়োতে সরস্বতীর মতো শুধু ভালোবাসার জন্য ভালোবাসতে পারা ব্যক্তিত্বময়ী কোনও প্রেমিকাকে।

কুয়াশাঘেরা ছোট্ট গ্রাম পাবং

নূপুর রায়

কালিম্পং শহর থেকে মাত্র ২২ কিলোমিটার দূরে ছবির মতো সুন্দর গ্রাম পাবং। গুটি কয়েক ঘর বাড়ি, একটা প্রাইমারি স্কুল, দু চারটে হোম স্টে, দুটো বিলাসবহুল ফার্ম হাউস। এ বাদে এখানে সত্যিই আর দেখার কিছুই নেই। তবে যা আছে তার হল অনাঘ্রাতা, অসামান্যা প্রকৃতি। চারিপাশে ঘিরে থাকা ন্যাওড়া ভ্যালির বিস্তীর্ণ জঙ্গল, কান পাতলেই ভেসে আসা পাখির কূজন আর মেঘের গায়ে লেগে থাকা বুনো ফুলের ঘ্রাণ। এমন একটা জায়গায় দু একদিন কাটিয়ে গেলে এমনিতেই মন ভাল হয়ে যায়।

কুয়াশার ওড়না জড়ানো নীলচে সবুজ পাহাড়, এলাচের ক্ষেত, ঝাড়ু গাছের ক্ষেত চিরে নিকষ কালো একটা পিচের রাস্তা পাকদণ্ডীর মতো উঠে গেছে একেবারে উপরে, ওই সবুজে মোড়া পাহাড়ের মাথায়। ওটাই হল চারখোল।

কালিম্পঙ থেকে পাবং আসার রাস্তাটাও অসাধারণ। মন কেড়ে নেওয়া একান্ত আপনজনের মতো। প্রতি মুহূর্তে ঘন সবুজ বর্ষণস্নাত প্রকৃতি দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করে বলে, এই তো এলে, একটু জিরিয়ে গেলে না হয়।

পথের সৌন্দর্য বড়িয়েছে দুই সহোদরা গ্রাম রেলি আর পলা আর তাদের নিজস্ব দুই নদী। ভরা বর্ষায় ঝমঝমিয়ে পাথর ডিঙিয়ে নেচে নেচে বয়ে চলেছে চপলা বালিকার মতো। খুব ইচ্ছে ছিল পা ডুবিয়ে ওদের সঙ্গে গল্প করি। বলি, আসবো আবার। এই তো চিনে গেলাম। সে আর হয়ে ওঠেনি।

পাবংয়ে আমরা উঠলাম ভট্টরাই হোমস্টে তে।। সম্ভ্রান্ত নেপালী ব্রাহ্মণ পরিবারের নিজস্ব বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া তিনটে ঘরেই পর্যটকদের থাকার

ব্যবস্থা। নিজস্ব ক্ষেত খামার, গোয়ালঘর, কাঠের দোতলা বসত বাড়ি, প্রশস্ত উঠান— সব মিলিয়ে খুব সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ। পুজো উপলক্ষে শহর থেকে আত্মীয় স্বজন এসেছেন। আর সঙ্গে যোগ দিয়েছি আমরা তিনজন। পুরো বাড়ি জুড়ে উৎসবের আমেজ। খুব সহজেই আমরা এবাড়ির সকলের সঙ্গে মিশে গেলাম।

বাধ সাধলো প্রকৃতি। আগের রাত থেকে যে বৃষ্টিটা শুরু হয়েছে, এখানে এসে তা আরও প্রবল আকার ধারণ করল। টিপ টিপ, রিমঝিম, ঝমঝম কোনও উপমাতেই তাকে আর বেঁধে রাখা গেল না। ছোটবেলায় পরীক্ষায় খুব কমন একটা রচনা ছিল— 'একটি বর্ষণ মুখর দিনের অভিজ্ঞতা'। এর যথার্থতা জীবনের প্রথমবার মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করলাম। আর বৃষ্টি একটু ধরতেই ছাতা সম্বল করে সোজা গ্রামের পথে।

প্রকৃত অর্থে গ্রাম বলতে যা বোঝায় এখানে তার রূপ কিছুটা ভিন্ন। পাহাড়ের কোলে অনেক সময় ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে দেশলাই বাক্সের মতো হঠাৎ করে একটা একলা বাড়ি নজরে আসে। এই হোমস্টে-টা অনেকটা তেমনি। বেশ কিছুটা এলাচের ক্ষেত পেরিয়ে আসতে হয়। এরপর ইতস্তত কিছু ঘর বাড়ি, নতুন তৈরি হচ্ছে এমন কিছু হোমস্টে, আর তার পর একটা প্রাইমারি স্কুল। উপরে ওঠার পথে রয়েছে অত্যাধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন কিছু ফার্ম স্টে। পাবং থেকে চার কিলোমিটার হেঁটে চারখোল গিয়ে ফিরে আসা যায়। আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় আমরা সেভাবে যাইনি।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে পৌঁছোলাম প্রাইমারি স্কুলের প্রাঙ্গণে। সেখানেই দুর্গা পুজোর আয়োজন হয়েছে। সারা গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে আনন্দ করছে। আমরাও সেই উৎসবে সামিল হলাম। পুজো শেষে প্রসাদ খেয়ে টিকা লাগিয়ে ফিরতে না ফিরতেই আবার আরেক প্রস্থ বৃষ্টি। তারপর এল সেই মায়াবী সন্ধে। একটা একটা করে দূরের পাহাড়ে জ্বলে উঠল আলো। বিন্দু বিন্দু সেই আলোগুলো জুড়ে গিয়ে তৈরি হল আলোর মালার। হিরের নেকলেসের মতো দ্যুতি ছড়ালো মেঘের গায়ে। এক সুতোয় বাঁধা পড়ল দূরপিন দাঁড়া, কালিম্পং, আলাগড়া থেকে সুদূর ভূটানের কিছু অংশ।

দূরের পাহাড়ের আলো দেখার সৌভাগ্য আগে হলেও, এত সুন্দর নির্দিষ্ট আকৃতি আগে কখনও দেখিনি। আবারও মুগ্ধ হলাম। কিছু মুহূর্ত লেন্সবন্দি হল। যা চর্মচক্ষে দেখতে পাইনি তা মানসচক্ষে কল্পনা করে নিলাম। আফসোস একটাই, আবহাওয়া ভাল থাকলে এ বাড়ির উঠান কিংবা জানালা থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা– সহ হিমালয়ের একটা বিস্তৃত রেঞ্জ দেখা যায়। কিন্তু আমরা তা দেখতে পাইনি।

খাওয়ার টেবিলে কথায় কথায় গল্প জমে উঠল। কার্শিয়াং থেকে এবাড়িতে পুজো উপলক্ষ্যে এসেছেন কাকু –কাকিমা। দু'জনই অধ্যাপক। ভাল বাংলা জানেন। ওনাদের কাছ থেকেই জানলাম পাহাড়ের শিক্ষা ব্যবস্থা, চাকরি–সহ বিভিন্ন সমস্যার কথা। জানলাম এই পাবং এর কথা। ১৯২০ সালে দূরপিন দাঁড়াতে আর্মি ক্যাম্প তৈরি হলে ওখানকার জনবসতিকে পাবং ও কাফের গাঁও তে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। ওনারা সেই ভাবেই এখানে এসেছেন। কাকু নিজে হাতে নতুন স্বাদের খাসির মাংস রান্না করে খাওয়ালেন। এই মাংস দু'দিন ধরে সংরক্ষিত হয়েছে কাঠের উনুনের তাপে, ফলে একটা আনকমন ফ্লেভার ছিল। খাওয়ালেন নিজের হাতে তৈরি স্পেশাল পান, মিষ্টি আরও কতকিছু। বলাবাহুল্য, এগুলোর কোনওটাই আমাদের প্রাপ্য পরিষেবার আন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিছু মানুষ এভাবেই মনের কাছাকাছি চলে আসেন। পরের দিন এই ভালোলাগাটুকু সঙ্গে নিয়েই চলে যাব চারখোল। ওখানেই কাটিয়ে আসব বাকি দুটো দিন।

বেঙ্গল টাইমস

১৬ মার্চ সংখ্যা

- ভোটের ময়দানে অর্বাচীনরা কেন?
- এত অসহিষ্ণুতা কেন?
- ডার্বি নিয়ে দুই প্রধান নিশ্চুপ কেন?
- বসন্তে পাহাড় সফর

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১। ই মেল: bengaltimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী